ভূমিকা

আমার গবেষণার বিষয় - মনোজ বসুর উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ। দীর্ঘ সাত বছরেরও বেশি সময়ের পর এই গবেষণার কাজ শেষ হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে একদা জনপ্রিয় হলেও সম্প্রতি প্রায় অপরিচিত লেখক মনোজ বসুর জীবন, রচনা ও উপন্যাস বিশ্লেষণের মতো দুরূহ প্রয়াস যথেষ্ট পরিশ্রম ও সময় সাপেক্ষ কাজ ছিল।

মনোজ বসুর জন্ম গত শতকের প্রথমে (১৯০১ সালের ২৫ শে জুলাই)। মৃত্যু ১৯৮৭ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর। কথাসাহিত্যিক মনোজ বসুর আবির্ভাব ছোটগল্পের ধারায় হলেও বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে তাঁর অবিসংবাদিত প্রাধান্য স্বীকৃত হয়ে ওঠে তাঁর জীবৎকালেই। দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে মানব জীবন ও চরিত্রকে উপস্থাপন করে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে মনোজ বসু সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিজস্ব শিল্পভুবন। জীবনকে দেখার ও দেখানোর কাজে নিজস্ব যে দৃষ্টিপ্রদীপ তিনি ব্যবহার করেছেন তা অনন্য। যেখানে স্রষ্টার আনন্দই প্রধান। উপদেশ বা হিতসাধন করার সংকল্প তাঁর নেই। রোমান্টিক অনুভূতির সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, সাধারণ মানব-মানবীর দাম্পত্য ও গার্হস্থ জীবন, সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের নিসর্গলগ্ন মানব জীবনের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে এক নূতন শ্রেণী তৈরী করেছেন মনোজ বসু তাঁর উপন্যাসে। সমকালের অন্যান্য লেখকেরা যেখানে অল্পবিস্তর স্বপ্নের অঞ্জন চোখে লাগিয়ে সমকালীন সমাজ জীবনের কথা প্রকাশ করেছেন; মনোজ বসু সেখানে সাদা চোখে সমাজের প্রকৃত রূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং নির্মম নিরপেক্ষ নিষ্ঠায় পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। সেদিক থেকে মনোজ বসুর এই আলোচনা অভিনব বলে আমাদের মনে হয়েছে। এই গবেষণায় আমরা শিল্পী মনোজ বসুর উপন্যাসগুলি প্রকাশকাল অনুসারে তুলে ধরেছি। সেইসঙ্গে উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যা উত্তরকালের সাহিত্যেচর্চার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি। প্রস্তাবনায় আমরা দাবি করেছিলাম; কথাসাহিত্যিক মনোজ বসুর উপন্যাসগুলির সূত্রে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার ক্রমবিকশিত রূপ কোথাও বিধৃত হয়নি। দীপক চন্দ্রের বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সংক্ষিপ্ত। একারণেই মনোজ বসুর শিল্প সৃষ্টির ধারাবাহিক ও নিবিড় বিশ্লেষণে তথা মূল্যায়নের প্রয়াস আছে আমাদের গবেষণায়।

লেখক মনোজ বসু জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন নিজের স্বচ্ছ ও সহৃদয় দৃষ্টিতে এবং আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন নিজস্ব রীতি ও নিয়মে। তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির আলোকে অনেক অনাবিষ্কৃত বিষয় আলোকিত হবে। একদিকে তিনি যেমন স্বাদ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন, তেমনি অন্যদিকে বাংলা কথাসাহিত্যে ভৌগোলিক সীমারেখাকে প্রসারিত করেছেন। তিনি কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিলেন না। বরং তিনি নিজেই নির্মাণ করেছেন নিজস্ব এক গোষ্ঠী। যা মূলত সুন্দরবন, যশোহর জেলার লোকজনদের নিয়ে তৈরী। তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে রচিত মনোজ বসুর উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করার একটি মৌলিক চেষ্টা রয়েছে আমাদের গবেষণায়। আমরা চেয়েছি, সময়ের প্রেক্ষাপটে সাহিত্যিক মনোজ বসু ও তাঁর সৃষ্টিকে তুলে ধরতে। যা উত্তরকালের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আমরা মনেকরি।

প্রস্তাবিত গবেষণা পত্রে আমাদের লক্ষ্য ছিল, মনোজ বসুর রচিত উপন্যাসগুলির সূত্রে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার আলোচনা থাকবে আমাদের গবেষণায়। যেখানে একই পাতায় ফুটে উঠবে উপন্যাসগুলির কাহিনী, চরিত্র বিশ্লেষণ ও নামকরণের সার্থকতা বিচার ও বিশ্লেষণ। পাঠকের চোখের সামনে সময়ের প্রেক্ষিতে মনোজ বসুর জীবন সংগ্রাম, দেশভাগের ফলে নিজের জন্মভূমি ত্যাগের কারণে জীবন যন্ত্রণা ও সাহিত্য রচনার একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস তৈরি করার চেষ্টা রয়েছে আমাদের এই গবেষণায়।

আমাদের গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায়: **মনোজ বসুর জীবনীসূত্র।** এই অধ্যায়ে লেখকের জন্ম, বংশ-পরিচয়, পড়াশোনা এবং কথাসাহিত্যিক মনোজ বসু হয়ে ওঠার ইতিহাস। এক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন তারিখ অভিধান ও কালপঞ্জীধর্মী গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। আবার মনোজ বসুর সুযোগ্য সন্তান মনীষী বসু নিজের ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও পারিবারিক গ্রন্থাগার ব্যবহারের ব্যাপারে আমাকে অকৃপণ সাহায্য করেছেন। সেইসঙ্গে মনোজ বসুর জীবনের বিভিন্ন অজানা তথ্য বলে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন মনীষী বসু মহাশয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে **মনোজ বসুর সৃষ্টি সম্ভার : সাধারণ পরিচয়।** এই অধ্যায়ে মনোজ বসু রচিত সাহিত্যসম্ভার, যেমন - কবিতা, ছোটগল্প, কিশোর সাহিত্য, নাটক, ভ্রমণ কাহিনী, উপন্যাস প্রভৃতির রচনাকাল অনুযায়ী সাধারণ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ের কাজ

করতে গিয়ে লক্ষ্য করছি লেখকের এমন কিছু রচনা রয়েছে যেগুলি সম্পর্কে পূর্বে কোনো আলোচনা কেউ করেননি। এই অধ্যায়ে আমরা মনোজ বসুর রচনাগুলির প্রথম প্রকাশকাল, উৎসর্গ ও বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার আলোচনা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে **মনোজ বসুর উপন্যাস বিশ্লেষণ**। মনোজ বসুর সাহিত্যিক প্রতিভা সম্পর্কে বাঙালী পাঠককুল এখন অনেকেই জানেন না। মনোজ বসুর নাম শুনেই অনেকে নাট্যকার মনোজ মিত্রের কথা ভেবেছেন। ত্রিশটির বেশি উপন্যাস রচয়িতা মনোজ বসুকে আমাদের এই গবেষণায় একালের পাঠকের কাছে উপস্থিত করার চেষ্টা হয়েছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের অনুসরণ যখন বাঙালী লেখকদের কাছে গৌরবের বিষয়, তখন মনোজ বসু পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রতি থেকেছেন উদাসীন। জাতীয় জীবনের হতাশা এবং মূল্যবোধের বিপর্যয় জনিত যন্ত্রণা ও অবসাদ লেখককে নগর বিমুখ করেছে। অন্যদিকে গ্রাম জীবনের অভিজ্ঞতা লেখককে করেছে মানবপ্রেমিক, প্রকৃতি-প্রেমিক ও রোমান্টিক। রাজনীতি, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, সমাজ, প্রেম তাঁর উপন্যাসে এসেছে মানুষের জীবনের বহুমুখী বৈচিত্র্য ও জীবনযুদ্ধে যুক্ত নরনারীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। আমাদের আলোচনায় লেখকের উপন্যাসগুলি প্রকাশকাল অনুসারে কাহিনী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি সম্পর্কে। উপন্যাসগুলির নামকরণ সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ে **সমকালীন ঔপন্যাসিক ও মনোজ বসু**। এই অধ্যায়ে আমরা কয়েকজন ঔপন্যাসিকের সঙ্গে মনোজ বসুর তুলনামূলক আলোচনা করেছি। নির্বাচিত লেখকদের মধ্যে রয়েছেন বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও শৈলজানন্দ। কল্লোল যুগে বর্তমান থাকলেও মনোজ বসু ছিলেন কল্লোলের নাগরিকতা থেকে মুক্ত। সেদিক থেকে তারাশঙ্করের সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে। তারাশঙ্করের মতো মনোজ বসুও পল্লীপ্রাণ ও রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। তারাশঙ্করের মতো মনোজ বসুও অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র কিংবা শৈলজানন্দের সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত নন। আবার মনোজ বসু ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমগোত্রজ শিল্পী বলা যায় না। তারাশঙ্করের গল্পে দেশের মানুষের রিক্ত ও বহুমাত্রিক সংকটময় যে রূপটি ধরা পড়েছে তা মনোজ বসুর শিল্প কর্মে গৃহীত হয়নি। তারাশঙ্করের রচনায় রাঢ় বাংলার আঞ্চলিকতার প্রতি ঝোঁক থাকলেও মনোজ বসু গ্রহণ করেছেন পল্লী বা বাদা অঞ্চলের অখ্যাত জনজীবন,

সমাজ ও উদ্বাস্তু জীবনের গভীর যন্ত্রণাটার ছবি। 'পথের পাঁচালী' থেকে 'ইচ্ছামতী' পর্যন্ত প্রকৃতির প্রসন্নতা ও সাধারণ মানুষের প্রতি মমতায় বিভূতিভূষণ শান্ত, উদার, ঊর্দ্ধমুখী, বিনম্র করুন। এই প্রকৃতিপ্রীতি ও জনজীবন মনোজ বসুর শিল্পী সত্তারও ভিত্তিভূমি, এক্ষেত্রে উভয়েই তারাশঙ্করের রুদ্রতা বীভৎসতা ও বলিষ্ঠতা থেকে অনেক দূরে। 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' উপন্যাসে শিবনারায়ণ ও কীর্তিনারায়ণ এবং 'নরবাঁধ' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় সিংহ চরিত্রের স্রষ্টা মনোজ বসু যেমন তারাশঙ্করের আত্মীয়, তেমনি 'জলজঙ্গল', 'বন কেটে বসত', 'আমার ফাঁসী হল'-র লেখক মনোজ বসু বিভূতিভূষণের আত্মীয়। আবার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বীরভূমের সাঁওতাল পরগণা ও রাণীগঞ্জের কয়লাশ্রমিক সাঁওতাল ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষদের কথা তুলে ধরেছেন 'কয়লা কুঠির দেশ' (১৯২৬), 'ঝোড়ো হাওয়া' (১৯২৩), 'বাংলার মেয়ে' (১৯২৫) প্রভৃতি উপন্যাসে। শৈলজানন্দের মত মনোজ বসু তাঁর 'বন কেটে বসত', 'জলজঙ্গল' নামক উপন্যাসগুলিতে বাদা অঞ্চলের মানুষের কথা লিখেছেন। শৈলজানন্দ কয়লাখনি অঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রা রূপায়িত করে বাংলা উপন্যাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। যাদের কথা মনোজ বসুর উপন্যাসে মিলে না।

পঞ্চম অধ্যায়ে **মনোজ বসুর উপন্যাসগুলির শিল্প প্রকরণ বিশ্লেষণ**-এ আমরা প্রয়াসী হয়েছি। প্রসঙ্গত তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত সংলাপ -এর ভাষাশৈলী, নাটকীয়তা, সাংবাদিকতা, বাক্যের গঠন ও উপন্যাসে ব্যবহৃত আত্ম-কথনরীতির মূল্যায়ণ আমরা এই অংশে তুলে ধরেছি।

সদালাপী মনোজ বসু গল্প করতে ও গল্প বলতে ভালোবাসেন। গল্প বলার বাসনা মৌলিকভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েই তাঁর শিল্পরীতির বিকাশ। আত্মকথন রীতির সাহায্যে মানব-জীবনের বিচিত্র ও বহু ব্যাপক প্রবাহের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা তাঁর ব্যক্তিত্বের কাঠামোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। আত্মকথন আঙ্গিকে মনোজ বসুর রচনা যতটা প্রাণবন্ত, লিপিধর্মী আঙ্গিকে ততটা নয়। তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও শিল্পীসত্তা এতটাই ঘনিষ্ঠ যে অনেক সময় রচনাটি গল্প না উপন্যাস তা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। 'আমার ফাঁসি হল', 'পথ কে রুখবে ?', 'ছবি আর ছবি' উপন্যাসগুলিতে এর অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে।

সরলতা, মনোজ বসুর রচনাশৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর লেখার ভাব, ভাষা, রচনাভঙ্গি খুবই সহজ। দ্বন্দ্বহীন মন, সংশয়হীন কল্পনা তাঁর শিল্পীচেতনাকে করেছে নির্বিরোধ। রচনাশৈলীর নামে আপন ভাবকল্পনাকে কোনরকম কৃত্রিমতার দ্বারা আড়ষ্ট করেনি। সকল রকম দুরূহতা জটিলতা থেকে মুক্ত। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মনোজ বসু সহজ স্বচ্ছন্দ ও অনাড়ম্বর। ভাষা তাঁর চিন্তা ও অনুভূতির অনুরূপ। অকারণে জটিল শব্দ ব্যবহার করে রচনাকে আড়ষ্ট করার পরিবর্তে মুখের সহজ সরল ভাষাকেই শিল্পের ভাষা করেছেন। ফলে কথকরীতির সঙ্গে অন্বিত হয়েই এই প্রকার ভাষার বিকাশ। সাধু এবং চলিত দুটি ভাষাতেই সাহিত্য-চর্চায় সিদ্ধহস্ত লেখক। গোড়ার দিকে সাধু ভাষায় রচনা শুরু করলেও পরবর্তীকালে চলিত ভাষাতেই করেছেন সাহিত্য সাধনা। চলিত ভাষার সাহিত্যে অনেক দেশীয় উপভাষা এবং মুসলমানী শব্দের ব্যাপক ব্যবহার করেন। যেমন - দেশী শব্দ: তেরিয়া, হররোজ, মাংনা, চাট্টি, রমারম প্রভৃতি। তবে কলকাতা কেন্দ্রিক চলিত ভাষাই বেশি।

মনোজ বসু তাঁর রচনাকে অতিবাস্তব করার জন্য আঞ্চলিক ভাষারীতিকে গুরুত্ব দেননি। বরং এক বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গি ব্যবহার করে অঞ্চল বিশেষের প্রাণসম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। ‘জলজঙ্গলে’র দুকড়ি, ‘বন কেটে বসতে’র মহেশ কথায় কথায় প্রাচীন রূপকথা - উপকথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তুলে ধরেছেন বাদা অঞ্চলে চলাফেরার নিয়মকানুন এবং বাদাবন সম্পর্কে নানা প্রবাদ-প্রবচন।

ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিকে মিলিয়ে দিতে লেখক বাস্তব সচেতন তথ্যের প্রতি ঝুঁকেছেন। অনিবার্যভাবে সাহিত্যায়নে এসেছে সাংবাদিকতা। ‘আগষ্ট ১৯৪২’ উপন্যাসে দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের - তীব্রতা ও গতিবেগ বোঝাতে লেখক ছোট ছোট সংবাদ পরিবেশন করেছেন। যে কারণে আন্দোলনের জোয়ারে খড়কুটোর মত হারিয়ে গেছে চরিত্রগুলি, ভেসে গেছে পাঠকও। ‘পথ কে রুখবে?’ উপন্যাসে মল্লিকাঘাটের ওয়েটিংরুমে কালহরণের সময় লেখক আয়োজন করেছেন সাংবাদিকতার। মনোজ বসু দক্ষ শিল্পী বলেই সাংবাদিকতাকে নিখুঁত ভাবে সাহিত্যায়ন করতে পেরেছেন।

উপসংহারে আমরা একথা বলতে চেয়েছি যে, একজন মানুষ তাঁর সামাজিক শ্রেণী অবস্থানের মধ্য দিয়েই লেখক হয়ে ওঠেন। তাঁর চিন্তা ও চেতনাকে তৈরী করে তাঁর সময়। সামাজিক,

রাজনৈতিক পরিধি ও প্রেক্ষাপট নির্মাণ করে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও শিল্পী সত্তাকে। লেখক মনোজ বসুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। জীবনকে তিনি দেখেছেন সামগ্রিক দৃষ্টিতে, তিনি সম্মুখীন হয়েছেন নানা জটিল আবর্তে। এরই মধ্যে নজরে এসেছে অনেক অসঙ্গতি। সব কিছুরই রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর উপন্যাস সাহিত্য। সেইজন্য তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিচিত্র। আমার গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল মনোজ বসুর উপন্যাসের বিষয় ও তার শিল্পরূপ নির্মাণ। এই কাজ পল্লী ও বাদা অঞ্চলের জনজীবন চর্চায় উত্তর কালের গবেষণা ও সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণে কার্যকরী হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

আমরা গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন করতে গিয়ে যেসকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের সাহায্য আমি পেয়েছি, তাদের কথা না বললে আমার এই গবেষণার পরিধি সম্পূর্ণ হবে না। তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার। যেসব গ্রন্থ আমার মন ও চিন্তাশক্তিকে সমৃদ্ধ করেছে, আমার গবেষণার পাঠ পূর্ণতা পেয়েছে, সেসব গ্রন্থের কথা আমি উল্লেখ করেছি গ্রন্থপঞ্জিতে। লেখক মনোজ বসুকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি উচ্চমানের সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত সকল পত্রিকার সম্পাদক ও পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকল গুণীজনকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। তাঁরা জানেন না যে, তাঁরা অলক্ষ্যে থেকে আমার লক্ষ্যকে কতখানি চালিত করেছেন। আমার এই গবেষণার কাজ করতে গিয়ে কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরি, কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থাগারের সাহায্যে পেয়েছি। এই গ্রন্থাগারগুলির বিচিত্র জ্ঞান ভাণ্ডারের সংস্পর্শ আমার গবেষণা কর্মকে যেমন ঋদ্ধ ও পূর্ণ করেছে তেমনি আমার জীবন অভিজ্ঞতাকেও সমৃদ্ধ করেছে, যা আমার পথ চলার পাথেয় হয়ে থাকবে।

এই গবেষণা কর্মে কয়েকজন ব্যক্তি আমাকে সর্বতভাবে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করেছেন ও বিভিন্ন মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই মনোজ বসুর পরিবারকে। বিশেষত মনোজ বসুর সন্তান মনীষী বসু মহাশয়কে। যিনি মনোজ বসু সম্পর্কে নানা অজানা তথ্য, বই এবং তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়ে আমাকে তাঁরা আবদ্ধ করেছেন ঋণপাশে। মনোজ বসুর সমগ্র পরিবারের প্রতি রইল আমার প্রণাম ও শুভকামনা। প্রণাম জানাই আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ডঃ লায়েক আলি খান মহাশয়কে। যিনি

স্নেহ ও শাসনে আমার লেখাপড়ার আশ্রয় হিসেবে বটবৃক্ষের মতো সবসময় পাশে থেকেছেন। তাঁর সাহচর্য, সুপরামর্শ, শাসন ও ভালোবাসা না পেলে এই গবেষণার কাজ আমি কখনোই সম্পূর্ণ করে উঠতে পারতাম না। সেইসঙ্গে যাঁর কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. লায়েক আলি খান মহাশয়ের স্ত্রী (আমার কাকিমা) ইরানী খান মহাশয়া। আমার গবেষণা কর্মটি যখন প্রায় বন্ধ হয়ে যেতে বসেছিল তখন উনার সাহস ও সুপরামর্শ না পেলে আমি কখনোই গবেষণা কাজটি শেষ করতে পারতাম না। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বানীরঞ্জন দে, ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. ছন্দা ঘোষাল, ড. সরোজ কুমার পান, ড. সুজিত কুমার পাল, ড. মহর্ষি সরকার মহাশয়কে আমার সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানাই। তাঁরা প্রত্যেকে আমার গবেষণাকর্মে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া আমার যেসকল বন্ধুরা সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই গবেষণা পত্রটির মুদ্রণ বিন্যাসে ও বাঁধাই কার্যে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলকেই জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার। সেইসঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমার গবেষণার কাজে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলকেই জানাই আমার নমস্কার ও ধন্যবাদ। আর যাঁদের কথা না বললে আমার বলা অপূর্ণ থেকে যাবে, তাঁরা হলেন আমার বাবা-মা ও পরিবারের সকল গুরুজন। সকলকে প্রণাম জানাই। তাঁদের স্নেহচ্ছায়াই আমার সকল কাজের প্রেরণা।